ভারতীয় বস্তুবাদ ও পরমাণুবাদ-২

বিরঞ্জন রায়

চার্বাক দর্শন

ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যের পরিক্রমায় আমরা দেখলাম, যদিও আধুনিককালে ভারতীয় দর্শনকে ভাববাদ ও রহস্যবাদের সঙ্গে সমীকৃত করার প্রবণতাটিই প্রবল, ঐতিহাসিক বিবেচনায় ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যে বস্তুবাদী ধারাটি কম শক্তিশালী নয়। তবে ভারতীয় বিদ্যা প্রসঙ্গে আল-বিরুনী যেমন বলেছেন, 'গোময় মেশানো মুক্তা', ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদের সঙ্গে মেশানো রয়েছে ভাববাদী গোময়। এর একমাত্র ব্যতিক্রম লোকায়ত বা চার্বাক দর্শন। এমন আপোষহীন সাহসী বস্তুবাদের সাক্ষাৎ অষ্টাদশ শতকের ফরাসি বস্তুবাদীদের আগে কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু এ ধারাটির চর্চা দ্বাদশ শতাব্দী নাগাদ রুদ্ধ হয়ে গেছে। তাদের রচনাগুলো লুপ্ত হয়ে গেছে বা বিরোধীরা লুপ্ত করে দিয়েছে। বর্তমানে চার্বাক সূত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, শুধু এর বিরোধী লেখকদের রচনায়। সেসব রচনায় চার্বাক দর্শনকে খণ্ডনের জন্য পূর্বপক্ষ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রায়শই সে উল্লেখ খণ্ডিত বা বিকৃত। একসার গবেষকের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় এসব ছিন্ন সূত্র থেকে চার্বাক দর্শনের পুনর্গঠন করা সম্ভব হয়েছে। আমরা এ পুনর্গঠিত চার্বাক দর্শনের পরিচয় দেব।

ভারতীয় সাহিত্যে বস্তুবাদের প্রথম আভাস ঋক্ বেদের 'ঋত' ধারণায়। এর আক্ষরিক অর্থ 'পথ' (বা হয়তো 'নিয়ম')। কিন্তু এটি শুধু প্রকৃতির পথ নয়, মানব সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের পথও। পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যে (উপনিষদ্) 'স্বভাব' শব্দ ঐ একই ধারণার উত্তরাধিকার বহন করেছে, যদিও তা আর আদিম অর্থে নয়। 'স্বভাব'কে আধুনিক বিজ্ঞানের 'প্রাকৃতিক নিয়ম' এর পূর্বপুরুষ বলা যায়। ইউরোপীয় দর্শনে পরমেশ্বরের ইচ্ছা হিসাবে 'প্রাকৃতিক নিয়ম' এর কথা পরিকল্পিত হয়েছিল। পরে এর ধর্মনিরপেক্ষ রূপ বিজ্ঞানে স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু ভারতে 'স্বভাব' বা প্রকৃতির নিয়ম এর ধারণা এসেছিল একেশ্বরবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে।

'লোকায়ত' শব্দটি অনেক প্রাচীন। প্রথমে এর অর্থ ছিল বিতণ্ডাশাস্ত্র বা তর্ক-র নিয়মকানুন। লোকায়তিক বলতে বুঝাত তার্কিক (বিপক্ষের মতে, কুতার্কিক)। পরে সেটি হয়ে দাঁড়ায় দেহাত্মবাদ এর প্রতিশব্দ। আত্মা ও পরলোক অস্বীকার করাই তার প্রধান দিক। তার পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে গড়ে উঠল এক প্রমাণশাস্ত্র। যাতে প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কোন প্রামাণ্যকে স্বীকার করা হয় না। এর বস্তুবাদী প্রতিবাদী ধারাটি গড়ে উঠেছিল আলাদা আলাদা উৎস থেকে। যেমন, কেউ অস্বীকার করেছেন অবিনাশী আত্মাকে, কেউ আপত্তি তুলেছেন পরকাল (স্বর্গ–নরক) এর ধারণার। কেউ মানতে চাননি বেদ এর প্রামাণ্যকে (বেদে যা আছে তাই সত্য– এই মতকে)। যজ্ঞে পশু বলিতে আপত্তি উঠেছে নানা সূত্র থেকে। বুদ্ধ-র সময়েই ভারতে এমন বহু অবৈদিক সম্প্রদায় ছিল যাদের দার্শনিক ধ্যান–ধারণা বস্তুবাদের কাছাকাছি। কিন্তু সবকটি মতবাদ মিলিয়ে একটি সুসংহত বস্তুবাদী দর্শন গড়ে উঠতে অনেক সময় লেগেছিল।এ প্রক্রিয়ায় বস্তুবাদের মূল ধারণাগুলি খ্রিষ্টীয় চার শতকের আগেই ভারতে রূপ পেয়েছিল। খ্রিষ্টীয় আট শতক থেকে বার শতকের মধ্যে বৈদিক ও অবৈদিক দার্শনিকগণের মধ্যে প্রচুর লড়াই চলেছিল। তখন থেকেই 'চার্বাক' শব্দটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

চার্বাক দর্শনের ছয়টি লক্ষণ ঃ

(১) ভূতবাদ ঃ মাটি, জল, আগুন আর বাতাস এই চারটি উপাদানই একমাত্র বাস্তব। সমস্ত জড় ও জীবের দেহই এগুলির এক বা একাধিক উপাদান দিয়ে তৈরী। এই চারটি উপাদানের এক বিশেষ সমবায়েই দেখা দেয় চেতনা বা চৈতন্য। এই চেতনা কখনই দেহ ছাড়া থাকতে পারে না। কোনো প্রাণী মারা গেলে, প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে তার চেতনাও শেষ হয়ে যায়। অজর, অমর আত্মা বলে কিছু নেই যা নাকি দেহ ছাড়াও আলাদাভাবে থাকতে পারে।

(২) স্বভাববাদ ঃ উপনিষদের যুগে, আরও কয়েকটি মতবাদের সঙ্গে, এটিও একটি আলাদা দার্শনিক মত ছিল। ঈশ্বর, নিয়তি, কাল ইত্যাদির বদলে বস্তুর নিজের স্বভাবকেই জগতের বৈচিত্র্যের কারণ বলে ধরা হতো। কালক্রমে অন্তত আংশিকভাবে এটি চার্বাক দর্শনের অঙ্গ হয়ে যায় বা এটিকে সেইমতো ধরা হয়।

(৩) প্রত্যক্ষ-প্রাধান্যবাদ ঃ জ্ঞানের উৎস হিসাবে প্রাণী-দেহের বাইরের কোনো বস্তুর সঙ্গে কোনো প্রাণীর ইন্দ্রিয়র (চোখ, কান, নাক, জিভ ও চামড়া) সংযোগকেই নিশ্চিত জ্ঞান বলে ধরা হয়। যে-জানার পেছনে এমন কোনো প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই তাকে 'প্রমাণ' (= সঠিক জ্ঞানের উপায়) বলে স্বীকার করা হয় না। এই কারণেই, ঈশ্বর পরলোক, আত্মা, পুণর্জন্ম, সর্বজ্ঞ পুরুষ - এইসব ধারণা চার্বাক দর্শনে খারিজ। যেহেতু ইন্দ্রিয় দিয়ে এগুলি প্রত্যক্ষ করা যায় না।

কোনো অনুমান বা আপ্তবাক্য (কোনো শাস্ত্রে লেখা আছে বা জ্ঞানী লোকেরা বলেছেন এমন কথা।) যদি প্রত্যক্ষমূলক বা প্রত্যক্ষ নির্ভর হয়, চার্বাকদের তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু অ-লৌকিক বিষয়ে স্রেফ অনুমানের ভিত্তিতে বা বেদ-পুরাণ, অমুক ঋষি, তমুক মুনির বলে কোনো কথা গ্রাহ্য হতে পারে না। চার্বাক বিরোধীরা প্রায়ই এটিকে বিকৃতি করে চার্বাকদের এই মতটিকে প্রত্যক্ষৈক-প্রমাণবাদী (অর্থাৎ প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, এটি ছাড়া অনুমান, আপ্তবাক্য ইত্যাদি কিছুই প্রমাণ নয়) এমনও মার্কা মেরে থাকেন। এই প্রচার শুধু ভুল নয়, এর পিছনে অন্য মতলবও কাজ করেছে।

(৪) পুনর্জন্ম-পরলোক-বিলোপবাদ ঃ দেহ ছাড়া কোনো ক্ষণিক বা অমর আত্মাকে চার্বাক দর্শনে স্বীকার করা হয় না। আগের তিনটি ধারণা থেকে অনিবার্যভাবে এটি আসে। ফলে জন্মান্তর, কর্মফল, স্বর্গ-নরক, অদৃষ্ট ইত্যাদি সবই বাতিল।

(৫) বেদপ্রামাণ্য-নিষেদবাদ ঃ ঈশ্বর বলে কেউ আছেন - কয়েকটি দর্শন প্রণালীতে এ কথা মানা হয় নি (যেমন সাংখ্য, মীমাংসা, বৈশেষিক)। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনেও ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয় না। কিন্তু নিরীশ্বরবাদী হলেও সাংখ্য, মীমাংসা ও বৈশেষিক'কে 'আস্তিক' বলে ধরা হয়। কারণ এসব দর্শনে বেদকে অভ্রান্ত বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ দর্শন এটি মানে নি বলে এরা 'নাস্তিক' দর্শন।

(৬) দুঃখবাদের বিরোধিতা ঃ যাবতীয় আস্তিক দর্শনেই বলা থাকে - দর্শন চর্চার মূল উদ্দেশ্য মোক্ষ লাভ। এর জন্যই জীবনের তিন বর্গ, ধর্ম-অর্থ-কাম-এর সঙ্গে যোগ হয়: মোক্ষ। মোক্ষ বা মুক্তি বলতে বুঝায় - সব দুঃখর হাত থেকে রেহাই পাওয়া। জন্ম হলেই দুঃখ পেতে হবে, সুতরাং পুনর্জন্মর চাকা থেকে বেরতে পারলে তবেই সত্যিকার মুক্তি লাভ হয়। এই একটি ব্যাপারে, সাংখ্য-যোগ-ন্যায়-বৈশেষিক-বেদান্ত এসব 'আস্তিক' দর্শনের সঙ্গে 'নাস্তিক' বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনও একমত।

যেন এদেরই বিরুদ্ধে, দুঃখবাদের বিরোধিতা করে চার্বাক বলেছেন: জীবনে সুখ-দুঃখ দুই-ই আছে। মাছ থাকলেই আঁশ-কাঁটা থাকবে, ধানের সঙ্গে তুষ। দুঃখের ভয় আছে বলে সুখকে ত্যাগ করা উচিত নয়। হরিণ আছে বলে কেউ কি শালিধান বোনেনা? ভিখিরি আছে বলে কেউ কি হাঁড়ি চড়ায় না? চোখে-দেখা সুখকে যে ত্যাগ করে, সে পশুর মতো বোকা।

চার্বাকরা কৃচ্ছসাধনের বিরোধিতা করেছেন বলেই তারা ইন্দ্রিয় সুখবাদী নন। বিরোধীরা তাদের উপর এ অপবাদটি আরোপ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে স্বর্গ-নরক দুই-ই বাতিল করে দিয়ে, ইন্দ্রিয় সুখ আর কৃচ্ছসাধনের দুটি প্রান্তকেই চার্বাকরা খারিজ করে দিয়েছিলেন।

জগৎ ও জীবনের অসংখ্য জটিলতা সম্পর্কে সচেতনতার কোনো নিদর্শন চার্বাক দর্শনের কোনোক্রমে টিকে যাওয়া শ্লোকগুলোতে পাওয়া যায় না। খুব বড় বা ছোট স্তরে বস্তুর বিন্যাস সম্পর্কে কোনো জ্ঞান বা উপলব্ধির নমুনা এই সূত্রগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না। স্বভাববাদ-এর ধারণায় প্রকৃতির নিয়ম সম্পর্কে এক ধরনের উপলব্ধির আভাস আছে। কিন্তু কার্যকারণ সম্পর্ক ব্যাপারটি আদৌ তার মধ্যে স্পষ্ট নয়। তবুও এতো আদি চেহারাতেও এই আপোষহীন বস্তুবাদী দর্শনটি আমাদের দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। শুধু ঈশ্বর নয়, পরকাল, পুনর্জন্ম আর বেদপ্রামাণ্যকে অস্বীকার করার মধ্যে সাহস ও স্বচ্ছ বুদ্ধির যে মিলন দেখা যায়, শুধু ভারতে নয়, আঠার শতকের দীপায়ন (এনলাইটেনমেন্ট)- এর আগে বিশ্ব দর্শনের ইতিহাসে তার আর কোনো নজির নেই।

চার্বাক দর্শনের সামাজিক তাৎপর্য

কেন ভারতের সব ধারার দার্শনিকেরা নিজেদের মধ্যকার বিরোধ ভুলে চার্বাক বিরোধিতায় একাট্টা হয়ে যান, তার কারণ শোনা যাক বিরোধীদের মুখেই। এজন্য আমরা জৈন দার্শনিক মণিভদ্রসূরি-র ব্যাখ্যা অনুসারে চার্বাক দর্শনের সামাজিক তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করব।

চার্বাক প্রত্যক্ষ-কেই প্রমাণ বলে স্বীকার করেন। কিন্তু কেন ? কারণ, প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলে মেনে নিলে প্রত্যক্ষের অযোগ্য পরলোক, জন্মান্তর, অবিনশ্বর আত্মা, পূর্বজন্মের কর্মফল ও অদৃষ্ট জনিত ইহলোকের দুঃখভোগ, পুণ্যকর্মের দ্বারা বা ঈশ্বর উপাসনার দ্বারা স্বর্গলাভ বা মুক্তি -- এ সমস্ত অন্ধ মূঢ় বিশ্বাস আর জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। নিপীড়িত শ্রমজীবী মানুষ তখন সমস্ত দুঃখ লাঞ্ছনার জন্য উচ্চবর্ণের কূটবুদ্ধি ও শ্রেণিস্বার্থ কলুষিত ধর্মীয় সমাজব্যবস্থাকে দায়ী করবে। তারা মানুষের বাঁচার অধিকারের দাবিতে বিদ্রোহ করবে। এই হল চার্বাক কর্তৃক প্রত্যক্ষকে প্রমাণরূপে স্বীকার করার সামাজিক তাৎপর্য। এবার বক্তব্যটি মণিভদ্রের নিজের ভাষায় (অনুবাদ) ব্যক্ত করছি ঃ

"যারা অস্পৃষ্ট, অনাস্বাদিত, অনাঘ্রাত, অশ্রুত, অদৃষ্ট, স্বর্গমোক্ষপ্রভৃতি সুখপিপাসায় চিত্ত সমর্পণ করে, দুঃসাধ্য তপস্যাদি জনিত ক্লেশ স্বীকার করে জীবন ক্ষয় করে, তাদের এ ধরনের জীবনযাপন হ'ল মহামূর্খতার দুঃসাহস মাত্র।

আরো একটা কথা-- কী আছে কী নেই প্রত্যক্ষকেই তার একমাত্র নিরিখ বলে মেনে নিলে জগৎটাকে আর অস্বীকার করা যায় না। (তাহলে জগতের অন্তর্গত আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ সমাজ ব্যবস্থাকেও বাস্তব বলে স্বীকার করতে হয়।) তখন বঞ্চিত দরিদ্রও মনে করবে, দেশের স্বর্ণভাণ্ডারে আমারও অধিকার আছে। (এ অধিকার কায়েম করে) তখন সেও অনায়াসে নিজের দারিদ্রকে পদদলিত করবে। দাসও মনে প্রাণে স্বাধীনতা অবলম্বন করে দাসত্ব করতে অস্বীকার করবে। কেউ আর নিজের অনভিপ্রেত জীবনযাত্রার দৈন্য মেনে নেবে না।

এভাবে সমাজে সেব্য-সেবক সম্বন্ধ বা ধনী-দরিদ্র সম্বন্ধ সম্বলিত শ্রেণিভেদ আর থাকবে না। তখন সংসারের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা বিলুপ্ত হবে। তাই প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ এই হল চার্বাকের সুস্থির সিদ্ধান্ত। ...তাই ধর্মের ভেকধারী পরবঞ্চনাপ্রবণ ধূর্তের দল অনুমান, শাস্ত্রবাক্য প্রভৃতিকে প্রমাণ বলে প্রচার করছে; এসব প্রমাণের দ্বারা পাপপুণ্য, স্বর্গনরক প্রভৃতি অলীক কল্পনাকে সত্য বলে নির্ধারণ করার চেষ্টা করছে; মূঢ় বিভ্রান্ত ইতর জনসাধারণের মধ্যে ধর্মান্ধতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হচ্ছে।"
(ষড়দর্শনসমুচ্চয়-এর মণিভদ্র কৃত টীকা, ৮১ শ্লোক)

চার্বাকদর্শনের এই সুগভীর সামাজিক তাৎপর্য মনে রাখলে 'লোকায়ত' কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে কষ্ট হয় না। সেব্য-সেবক ধনী-দরিদ্র ভেদহীন সমাজব্যবস্থার প্রতি জৈন দার্শনিকদের (তাদের অন্য প্রতিপক্ষদের মতোই) কোনো সহানুভূতি ছিল না। তাই চার্বাক দর্শনের সামাজিক তাৎপর্য অনুধাবন করে জৈন দার্শনিকগণও ভয় পেয়েছেন এবং (তাদের অন্য প্রতিপক্ষদের মতোই) চার্বাক দর্শনকে স্থূলভোগের দর্শন (খাও দাও ফূর্তি কর) হিসাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। আরেকটি বিষয়, চার্বাকরা সবধরণের অনুমানকে স্বীকার না করলেও প্রত্যক্ষনির্ভর অনুমানকে স্বীকার করতেন। তার অনেক বিরোধীদের মতো মণিভদ্র-ও এটি চেপে গেছেন। এভাবে চার্বাকরা যে দর্শনচিন্তায় অনগ্রসর তা প্রমাণ করা যায়।

ভারতীয় পরমাণুবাদ

প্রাচীন ইউরোপীয় দর্শনে পরমাণুবাদ লক্ষ্যযোগ্য হলেও ক্ষীণ। লেউকিপ্পুস-দেমোক্রেতুস থেকে এপিকুরস হয়ে লুক্রেৎসিউসেইতা সমাপ্ত। মধ্যযুগে তার হদিস ছিল না। আধুনিক যুগেই তা পুনরাবিষ্কৃত হয়ে বিকশিত হয়েছে। বিপরীতে ভারতীয় পরমাণুবাদের ব্যাপ্তি দুই হাজার বছর--খৃষ্টপূর্ব শতাব্দী থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত। ন্যায়-বৈশেষিক ধারা এর প্রধান প্রবক্তা হলেও অন্য অনেক দার্শনিক ধারাই একে গ্রহণ করেছিল। জৈন দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই পরমাণু। বৌদ্ধ দর্শনের বৈভাসিক ও সৌত্রান্তিক এ দুটি বাস্তববাদী (realist) ধারাই পরমাণুবাদ গ্রহণ করেছে। মীমাংসকরা পরমাণুবাদ মেনে নিয়েছেন। আদি সাংখ্য-যোগ ধারায় যদিও পরমাণু নেই, কিন্তু মধ্যযুগে এর ভাষ্যকারগণ পরমাণুকে তাদের সত্তাতাত্ত্বিক বিবর্তনের অংশ করেছেন। পরমাণুবাদের বিরোধীতা করেছে বৌদ্ধ দর্শনের মাধ্যমিক ও যোগাচারী এ দুটি ভাববাদী ধারা এবং বেদান্ত দর্শন। পরমাণু সম্পর্কে চার্বাকদের কোনো মত পাওয়া যায় না।

ভারতীয় পরমাণুবাদ এর পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়েছে বৈশেষিক দর্শনে। বৈশেষিক দর্শনে বৌদ্ধ দর্শনের মতো, শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ ও অনুমান-কে প্রমাণ বলে স্বীকার করা হয়। এ-দর্শনে বিশ্বের জ্ঞেয় বিষয়সমূহকে সাত ধরনের সত্তা বা সাতটি বর্গে ভাগ করা হয়। সে-দর্শনের পরিভাষায় এক একটি বর্গ এক একটি 'পদার্থ'। পদের অর্থই পদার্থ (পদ + অর্থ = পদার্থ)। বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দই 'পদ'। এই 'পদ'-কে অর্থ বা মানে দেয়, অর্থাৎ 'পদ' যা বুঝায়, তা পদের বাইরের কিছু। এটিই 'পদার্থ'। এ-পদার্থসমূহ ঃ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব। দ্রব্য নয় প্রকার, গুণ চব্বিশ প্রকার, কর্ম পাঁচ প্রকার, সামান্য দুই প্রকার, বিশেষ বহু, সমবায় এক, অভাব দুই। যেমন বায়ু একটি 'দ্রব্য পদার্থ'। বায়ু স্পর্শযোগ্য, স্পর্শযোগ্যতা বায়ুর 'গুণ পদার্থ'। বায়ু গতিশীল, এজন্য অন্য দ্রব্যকে সরাতে-নড়াতে পারে। গতি বায়ুর 'কর্ম পদার্থ'। বিভিন্ন গ্যাসকে আমরা বায়বীয় বস্তু বলি। বিভিন্ন গ্যাসের মধ্যে বিদ্যমান যে বৈশিষ্ট্যের জন্য এসবকে আমরা বায়বীয় শ্রেণিতে গণ্য করি, সে সাধারণ বৈশিষ্ট্যটিই (বায়বীয়তা) 'সামান্য পদার্থ'। যে বৈশিষ্ট্যের জন্য একপ্রকার গ্যাস অন্যপ্রকার গ্যাস হতে স্বতন্ত্র বা বিশেষ (সাধারণ বা সামান্য নয়), সে বৈশিষ্ট্যটিই 'বিশেষ পদার্থ'। স্পর্শযোগ্যতা, গতি, বায়ুত্ব (গ্যাসত্ব), বিশেষত্ব (বিভিন্ন গ্যাসের) প্রভৃতি 'পদার্থ', বায়ু 'দ্রব্য পদার্থে' যা দ্বারা সম্বন্ধিত হয়ে থাকে, সেটিই 'সমবায় পদার্থ'। উপরে বর্ণিত ছয় প্রকার পদার্থের অস্তিত্ব আছে। তাই এ-সকল ভাব পদার্থ। ভাব পদার্থের যা বিপরীত তাই অভাব পদার্থ। যেমন পুকুরে কোনো মাছ নাই। আমরা বলব পুকুরে মৎসাভাব। এ-অভাবও অর্থবোধক, অর্থাৎ পদকে অর্থ দেয়। তাই অভাবও পদার্থ। পদকে নয় প্রকার দ্রব্য ঃ মাটি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা, মন। মাটি, জল, তেজ, বায়ু অনিত্য। অর্থাৎ এসবের সৃষ্টি ও ধ্বংস আছে। অন্য পাঁচটি দ্রব্য নিত্য। অর্থাৎ এসবের সৃষ্টি ও ধ্বংস নাই। কেবলমাত্র মাটি, জল, তেজ, বায়ু পরমাণু গঠিত।

মাটি, জল, তেজ, বায়ু অনিত্য হলেও, এদের গঠনকারী পরমাণুসমূহ নিত্য।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে পরমাণু পদার্থের সবচেয়ে ক্ষুদ্র অংশ। পরমাণুকে কেউ সৃষ্টি করে নি। পরমাণু সব সময়ই বর্তমান। সৃষ্টির সময় পরমাণুগুলো বিভিন্ন বিন্যাসে সংগঠিত হয়ে রূপময় জগত সৃজন করে। রূপের পরিবর্তনের মূলে রয়েছে পরমাণুর বিন্যাসের পরিবর্তন। প্রলয়ের সময় পরমাণু সমূহ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরমাণু চার প্রকার। মৃত্তিকা, জল, তেজ ও বায়ু পরমাণু। পরমাণুর চব্বিশ প্রকারের গুণ রয়েছে। এদের কতগুলি সামান্য গুণ যা প্রত্যেক পরমাণুতেই পাওয়া যায়। যেমন সংখ্যা, আকার (পরমাণু গোলাকার), সংযোজন ও বিয়োজন ক্ষমতা ইত্যাদি। আর কতগুলি গুণ বিশেষ গুণ। যা কোনো বিশেষ পরমাণুতেই পাওয়া যায়। যেমন মৃত্তিকা পরমাণুর বিশেষ গুণ, স্পর্শ বর্ণ স্বাদ ও গন্ধ। জল পরমাণুর বিশেষ গুণ স্পর্শ (শীতলতা) বর্ণ স্বাদ। তেজ পরমাণুর বিশেষ গুণ স্পর্শ (উষ্ণতা) ও বর্ণ। বায়ু পরমাণুর বিশেষ গুণ স্পর্শ (শীতল বা উষ্ণ)। মৃত্তিকা পরমাণুর চারটি বিশেষ গুণ তেজ পরমাণু প্রভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। পরমাণুর অন্যসব গুণ অপরিবর্তনেয়। একজাতীয় দুটি পরমাণু একত্রে মিলে একটি 'দ্বয়াণুক' গঠন করে। এমন তিনটি দ্বয়াণুক মিলিত হয়ে একটি 'ত্রয়াণুক' গঠিত হয়। একটি ত্রয়াণুক সবচেয়ে ক্ষুদ্র দৃশ্যমান বস্তু। অন্ধকার ঘরের ভিতর ছোট ছিদ্র পথে সূর্যালোক প্রবেশ করলে, সে আলোর গতিপথে যেসব ভাসমান ক্ষুদ্র কণিকা নজরে পড়ে এসবই ত্রয়াণুক বা ত্রসরেণু। লক্ষ্যণীয়, একক পরমাণুর আয়তন নেই, কিন্তু কতগুলি পরমাণুর সমাবেশ আয়তন বিশিষ্ট। অর্থাৎ এখানে পরিমাণগত পরিবর্তন গুণগত পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। (গ্রীক পরমাণুবাদীরা মনে করতেন, আয়তনহীন কিছু যুক্ত হয়ে আয়তনবিশিষ্ট কিছু গঠিত হতে পারে না। তাই তারা বলেছিলেন পরমাণুর আয়তন আছে।)

জৈন দর্শনে বস্তুকে 'পুদ্গল' বলে। পুদ্গল দু প্রকার, স্থূল ও সূক্ষ্ম। আমাদের চারপাশের প্রত্যক্ষগোচর জগতই স্থূল জগত। পাপ-পূণ্য ইত্যাদি কর্মও জৈন মতে বস্তুময়। তবে তা সূক্ষ্ম বস্তু। স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় প্রকার পুদ্গলই পরমাণু গঠিত। পরমাণু আয়তন বিশিষ্ট এবং শ্বাশ্বত। প্রতিটি পরমাণুরই গন্ধ স্বাদ বর্ণ এবং দুরকমের স্পর্শ (শীতলতা ও উষ্ণতা) রয়েছে। পরমাণুস্থিত দ্রব্য শ্বাশ্বত কিন্তু পরমাণুর গুণ পরিবর্তন যোগ্য। একরকম আদি পরমাণু থেকেই বিভিন্ন ধরনের পরমাণু বিবর্তিত হয়। এ প্রক্রিয়ায় আদি পরমাণু মৃত্তিকা জল তেজ বায়ু এসব পরমাণুর রূপ নেয়। একটি পরমাণু প্রত্যক্ষগোচর নয় কিন্তু পরমাণুর সমাহার প্রত্যক্ষগোচর হয়।

বৌদ্ধ দর্শনের বৈভাসিক ও সৌত্রান্তিক ধারায় পরমাণু স্বীকৃত। এসব মতে আমাদের প্রত্যক্ষ রূপময় জগত পরমাণু গঠিত। তবে পরমাণু নিত্য ও শ্বাশ্বত নয়। পরমাণু অনবরতই ধ্বংস ও সৃষ্টি হয়। পরমাণুর বিশেষ গুণ আছে কিংবা পরমাণু বিশেষ কর্ম করে, এভাবে না দেখে বৌদ্ধরা বলেন, কণিকা রূপ যে বিশেষ গুণ ও বিশেষ কর্ম, তাই বিশেষ পরমাণু। চার ধরনের বিশেষ গুণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট চার ধরনের বিশেষ কর্ম থেকে আমরা ধরে নিই, চার ধরনের পরমাণু রয়েছে। যেমন কণিকা রূপ কঠিনতা, যা কিছু ধরে রাখতে পারে, তাই মৃত্তিকা পরমাণু। যেমন মাটির কলসি জল ধরে রাখে। কণিকা রূপ আঁঠালোতা, যা বিভিন্ন ধরনের পরমাণুকে একত্রে সংযুক্ত করতে পারে, তাই জল পরমাণু। যেমন জল মিশিয়ে ছাতু দিয়ে মণ্ড করা যায়। কণিকা রূপ উষ্ণতা, যা অন্য পরমাণুতে পরিবর্তন আনতে পারে, তাই তেজ পরমাণু। যেমন মাটির ইট আগুনে পোড়ালে মেটে রং লাল হয়ে যায়। কণিকা রূপ গতি, যা অন্য বস্তুকে গতিশীল করতে পারে, তাই বায়ু পরমাণু। যেমন বাতাস পাতা উড়িয়ে নিয়ে যায়। প্রতিটি স্থূল বস্তুতে চার ধরনের পরমাণুই বিদ্যমান। বস্তুটির ধর্ম নির্ভর করে কোন ধরনের পরমাণু আপেক্ষিক সংখ্যা বেশি তার উপর। একটি পরমাণু প্রত্যক্ষগোচর নয়। সাত কিংবা আটটি পরমাণুর সমাবেশই প্রত্যক্ষগোচর।

মীমাংসকরা বৈশেষিক পরমাণুবাদকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এ নিয়ে নতুন কিছু বলেন নি।

সাংখ্য-যোগ এর সত্তাতাত্ত্বিক বিবর্তনটি নিম্নরূপ-

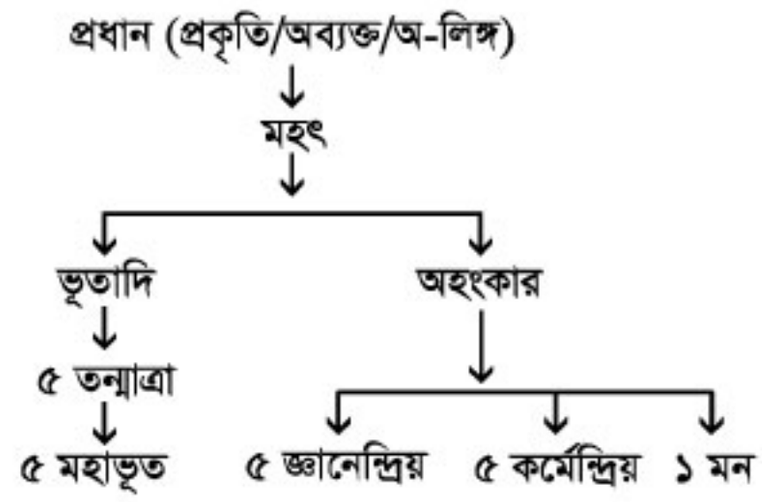

পঞ্চতন্মাত্রাঃ গন্ধ রস রূপ স্পর্শ ও শব্দ। পঞ্চভূত ঃ মৃত্তিকা জল অগ্নি বায়ু ও আকাশ। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ঃ নাসিকা জিহ্বা চক্ষু ত্বক ও কর্ণ। পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ঃ বাক্-ইন্দ্রিয়, হস্ত, পদ, মল-ইন্দ্রিয় এবং মূত্র-ইন্দ্রিয়।

প্রধান বা প্রকৃতিতে তিনটি গুণ সত্ত্ব (প্রকাশময়তা) রজঃ (গতিময়তা) এবং তমঃ (স্থবিরতা) সাম্যবস্থায় থাকে। তাই এ অবস্থাটি স্থিতিশীল এবং অব্যক্ত। অসংখ্য নিষ্ক্রিয় পুরুষ এর অলৌকিক প্রভাবে এ সাম্যবস্থা বিঘ্নিত হয় এবং পরিবর্তনের সূচনা হয়। আদি সাংখ্যে পরমাণুর উল্লেখ নেই। মধ্যযুগীয় সাংখ্যে পঞ্চভূতের মূল হিসাবে পরমাণুর উৎপত্তি বর্ণিত হয়েছে। পাঁচটি ভূতের মতোই পরমাণুও পাঁচ প্রকার। তন্মাত্রা প্রত্যক্ষগোচর নয় কিন্তু পরমাণু প্রত্যক্ষগোচর। ন্যায়-বৈশেষিক মতে পরমাণু প্রত্যক্ষগোচর নয়। সে মতে পরমাণু অবিভাজ্য। কিন্তু সাংখ্য-যোগে পঞ্চভূতের ক্ষুদ্রতম উপাদান পরমাণু। কিন্তু পরমাণু এর চেয়েও সূক্ষ্ম উপাদান তন্মাত্রা দিয়ে গঠিত। সাংখ্য-যোগে বস্তুর পরিবর্তনের কারণ হিসাবে পরমাণু সমূহের সংযোজন বিয়োজনকে মানা হয়নি। বস্তুর পরিবর্তনের কারণ হিসাবে মানা হয়েছে তিন গুণের আপেক্ষিক পরিবর্তনকে। কাজেই আমরা বলতে পারি মধ্যযুগের সাংখ্য-যোগ ভাষ্যকাররা 'পরমাণু' শব্দটি গ্রহণ করলেও 'পরমাণুবাদ'কে গ্রহণ করেন নি।

আদি বৈদান্তিকেরা প্রত্যক্ষগোচর জগতের মূল হিসাবে 'প্রকৃতি'কে স্বীকৃতি দেন নি। তাদের সব যুক্তি নিয়োজিত করেছেন এর খণ্ডনে। কিন্তু পরবর্তী বৈদান্তিকেরা সাংখ্য দর্শনের সত্তাতাত্ত্বিক বিবর্তনের কাঠামোটিকে গ্রহণ করেছেন। দ্বৈতাদ্বৈত ও দ্বৈতবাদী বৈদান্তিকরা সাংখ্যের অসংখ্য নিষ্ক্রিয় পুরুষকে না মেনে মেনেছেন ইচ্ছাময় এক ঈশ্বরকে। যার ইচ্ছায় প্রকৃতিতে পরিবর্তন হয়। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকরা বলেছেন প্রকৃতি ব্রহ্মের মায়া মাত্র। কাজেই সাংখ্য বর্ণিত প্রকৃতির পরিবর্তন প্রাতিভাসিক বা আপতিক সত্য মাত্র, পরমার্থিক সত্য নয়। বৈদান্তিকরা যেমন কখনোই সাংখ্যের 'প্রকৃতি প্রধানবাদ'কে স্বীকৃতি দেননি, তেমনি স্বীকৃতি দেননি বৈশেষিক পরমাণুবাদকেও। কাজেই বৈদান্তিক দর্শনে পরিবর্তিত সাংখ্যের অংশ হিসাবে পরমাণু স্বীকৃত হলেও, বৈদান্তিকরা পরমাণুবাদের প্রধান প্রতিপক্ষ।

ন্যায়-বৈশেষিক, জৈন, মীমাংসা প্রতিটি দর্শনেই আত্মা স্বীকৃত। আত্মা পরমাণুগঠিত নয়। বৌদ্ধেরা আত্মায় বিশ্বাস করেন না। কিন্তু অন্য দর্শনগুলোর (চার্বাক ভিন্ন) মতোই কর্মবাদ ও পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন। আত্মা না থাকলে কর্মবাদ ও পুনর্জন্ম কিভাবে সম্ভব ? বৌদ্ধেরা বলেন কর্ম, চেতনা বা বিজ্ঞান-এ সংস্কার আনে। এই সংস্কৃত চেতনাই জন্ম জন্মান্তরে বাহিত হয়। তবে এ চেতনাও স্থায়ী নয়। অনবরতই তা ধ্বংস হচ্ছে ও জন্ম নিচ্ছে। এভাবে একটি চেতনা-সন্ততির ধারা তৈরী হচ্ছে। এ ধারাটি

ব্যক্তির মৃত্যুর সঙ্গে থেমে না গিয়ে জন্মান্তরে প্রবাহিত হচ্ছে। বৌদ্ধদের এ চেতনা বা বিজ্ঞান পরমাণু গঠিত নয়।

সৃষ্টি ও প্রলয় নিয়ে বৌদ্ধেরা মাথা ঘামান নি। লোক (জগত) নিত্য কি অনিত্য, অন্তবিশিষ্ট না অনন্ত, এসব বিষয়কে বুদ্ধ 'অকথনীয়' (আলোচনার অযোগ্য) বিবেচনা করেছেন। জৈনরা মনে করেন লোক শ্বাশ্বত। ন্যায়-বৈশেষিক প্রলয় ও সৃষ্টিতে বিশ্বাসী। সুতরাং তাদেরকেই এ উত্তর দিতে হয়েছে, প্রলয়ের পর সৃষ্টির শুরু কিভাবে। কী বিচ্ছিন্ন পরমাণুগুলোর মধ্যে সংযোগের সূচনা করে সৃষ্টি আরম্ভ করে। তারা উত্তর দিয়েছেন 'অদৃষ্ট'। অদৃষ্ট কথাটির আক্ষরিক অর্থ 'যা দেখা যায় না'। সাধারণ অর্থে অজানা বা অজ্ঞাত কোন ঘটনার ব্যাখ্যা হিসাবে কোন অজ্ঞাত নির্ণায়কের প্রস্তাব করাটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নির্মাণে মানানসই। সে-ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় অজ্ঞাত নির্ণায়কটির ধরন অন্যান্য জ্ঞাত নির্ণায়কের মতো। একেবারে ভিন্ন কিছু নয়। বৈশেষিকদের অদৃষ্ট কিন্তু বিজ্ঞানীদের অজ্ঞাত নির্ণায়কের মতো নয়। বৈশেষিক মতে অদৃষ্ট দ্রব্য এবং আত্মার সেই অজ্ঞাত গুণ যা মহাবিশ্বে একটি শৃঙ্খলা আনে এবং আত্মাদের কর্ম (পাপপূণ্য) অনুসারে ফলভোগের জন্য বিশ্বকে সাজায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে অদৃষ্ট অজানা কারণ নয়, পরম উদ্দেশ্যমূলক (teleological) কারণ। এ আদি 'অজ্ঞাত নির্ণায়ক'টির রহস্যময় রূপ তার রহস্যের খোলসটি ছেড়ে দিয়ে বৈজ্ঞানিক অজ্ঞাত নির্ণায়ক ধারণায় রূপান্তরিত হতে পারে নি। বরং পরবর্তী ভাষ্যকাররা অদৃষ্টকে বিশুদ্ধ রহস্যময় ধারণা 'ঈশ্বরের ইচ্ছা'তে রূপান্তরিত করেছেন।

অবশ্য পরমাণু সংযোগ-এর বিষয়টি বৈশেষিকরা অদৃষ্টের মধ্যেই সীমিত রাখেন নি। তারা বলেছেন দুটি পরমাণু মিলে দ্বয়াণুক ও তিনটি দ্বয়াণুক মিলে ত্রয়াণুক গঠন শুধু মাত্র এক প্রকার ভূতের পরমাণু সমূহের মধ্যেই ঘটে; ভিন্ন ভূতের পরমাণু সমূহের মধ্যে নয়। যেমন মৃত্তিকার সঙ্গে মৃত্তিকার, জলের সঙ্গে জলের; মৃত্তিকার সঙ্গে জলের নয়। তবে বিভিন্ন ভূতের দ্বয়াণুক মিলিত হয়ে জটিল যৌগ গঠন করতে পারে। বৈশেষিকরা বলেন পরমাণুর সংযোগ বিয়োগ এর জন্য যে শক্তি প্রয়োজন তা আসে তেজ পরমাণু থেকে। তাদের মতে রাসায়নিক পরিবর্তনের জন্য তেজ অপরিহার্য। সে তেজ হতে পারে সূর্য বা আগুনের কিংবা জৈব তেজ--যা জীবের দেহে পরিবর্তন ঘটায়। বৈশেষিকরা বলেন রাসায়নিক পরিবর্তনের সময় তেজের প্রভাবে অণু পরমাণুতে ভেঙ্গে যায় এবং পরমাণুর গুণের পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তিত পরমাণু সমূহ সংযুক্ত হয়ে নতুন অণু গঠন করে। তাদের এ তত্ত্বের নাম 'পিলু পাক' (পিলু = পরমাণু)। নৈয়ায়িকরা বলেন তেজের প্রভাবে অণু সমূহ সরাসরি পরিবর্তিত হয়। পরমাণু সমূহের গুণ পরিবর্তিত হয় না। তাদের এ তত্ত্বের নাম 'পিঠর পাক' (পিঠর = অণু)।

জৈনরা পরমাণু সমূহ সংযোগের কারণ হিসাবে অদৃষ্ট আমদানি করেন নি। তারা বলেছেন দুটি পরমাণুর মধ্যকার আকর্ষণ তাদের একত্রিত করে। বৈশেষিকরা যেমন মনে করেন কোন এক ধরণের পরমাণু সেই ধরণের পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে দ্বয়াণুক ও ত্রয়াণুক তৈরী করে; জৈনরা তেমন মনে করেন না। তাদের মতে বরং দুটি ভিন্নধর্মী পরমাণু পরস্পর সংযুক্ত হয়। যেমন শুষ্ক (মৃত্তিকা) আর্দ্র (জল) পরমাণুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়। জল পরমাণুর যুক্ত করার গুণ রয়েছে। সেজন্য এগুলো বিভিন্ন পরমাণুর মধ্যে সংযোগকারী হিসাবে কাজ করে। বিভিন্ন পরমাণুর মধ্যে পারস্পরিক আসক্তির তীব্রতার পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যই নির্ণয় করে কোন দুটি পরমাণু যুক্ত হবে। পরমাণু গুলি যে বিভিন্ন রকমের বস্তু তৈরী করে, তার কারণ তারা বিভিন্ন জ্যামিতিক আকারে (গোল বা ঘন আকার) যুক্ত হয়। তাদের আভ্যন্তরীন সংযোগও বিভিন্ন ধরনের। কোথাও তারা পরস্পরকে স্পর্শ করে থাকে, কোথাও তাদের মধ্যে ফাঁক থাকে। সেক্ষেত্রে পারস্পরিক আকর্ষণ তাদেরকে যুক্ত রাখে।

বৌদ্ধ মতে পরমাণু নিজস্ব গুণের জন্যই পরস্পরের কাছে আসে। পরমাণু ভেদে এ গুণের তারতম্য আছে। তাই সব ধরনের পরমাণু একত্রিত হয় না। বিশেষ ধরনের পরমাণু বিশেষ পরমাণুর সঙ্গে মিলিত হয়। কোন দ্রব্য গঠন করতে পরমাণু সমূহ একে অন্যের সঙ্গে মিশে যায় না। পাশাপাশি অবস্থান করে মাত্র। তাদের মধ্যে ফাঁক থাকে। এ ফাঁক সত্ত্বেও পরমাণু সমূহ একে অন্যের কাছে থাকায় তারা পরস্পরকে প্রভাবিত করতে পারে।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে পরমাণু সদা স্পন্দনশীল। তারা সব গতি-কে পরমাণুর গতি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। জৈনরা বলেছেন পরমাণু গতিশীল কিংবা স্থিতিশীল দুই অবস্থাতেই থাকতে পারে। পরমাণু এমন গতি অর্জন করতে পারে যে, মুহুর্তের মধ্যে বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত অতিক্রম করতে পারে। পরমাণুর গতি হতে পারে সরলরৈখিক বা চক্রাকার।

বৌদ্ধমতে আকাশ শূন্যতা মাত্র। সেজন্য তা শ্বাশ্বত ও সর্বব্যাপ্ত। ন্যায়-বৈশেষিক মতে আকাশ সর্বব্যাপী নিষ্ক্রিয় স্থান। ন্যায়-বৈশেষিক মতে আকাশ ও দিক (পূর্ব দিক পশ্চিম দিক ইত্যাদি) একটি দ্রব্য বা সত্তা। তবে এসব পরমাণু গঠিত নয়। সব ঘটনাই আকাশের মধ্যে ঘটে। সেই হিসাবে কাল ও অদৃষ্টের মতো আকাশ সব ঘটনার সাধারণ কারণ। আকাশের বিশেষ গুণ শব্দ। জৈন মতে আকাশ শূন্যতা নয়। আকাশ মর্তলোক ও উর্ধ্বলোক ব্যাপ্ত করে থাকা একটি মাধ্যমের মত। যার মধ্যে পুদ্গল ও আত্মা গমানাগমন করতে পারে।

দেখা যাচ্ছে চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ কোন নাস্তিক ধারাতেই আকাশকে 'ভূত' বলে মানা হয় নি। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-যোগ এবং তাদের অনুসরণে বেদান্ত আকাশকে ভূত বলে মেনেছে। সাংখ্যের সত্তাতাত্ত্বিক বিবর্তন ধারায় অহংকার থেকে 'ভূতাদি' বিবর্তিত হয়। ভূতাদি থেকে প্রথমে শব্দ তন্মাত্রা এবং ক্রমে শব্দ থেকে স্পর্শ, স্পর্শ থেকে রূপ, রূপ থেকে রস এবং রস থেকে গন্ধ, এভাবে তন্মাত্রা সমূহ বিবর্তিত হয়। তারপর শব্দ তন্মাত্রা থেকে আকাশ পরমাণু বিবর্তিত হয়। ক্রমে আকাশ পরমাণু সঙ্গে স্পর্শ তন্মাত্রা যুক্ত হয়ে বায়ু পরমাণু, বায়ু পরমাণুর সঙ্গে রূপ তন্মাত্রা যুক্ত হয়ে তেজ পরমাণু, তেজ পরমাণুর সঙ্গে রস তন্মাত্রা যুক্ত হয়ে জল পরমাণু এবং জল পরমাণুর সঙ্গে গন্ধ তন্মাত্রা যুক্ত হয়ে মৃত্তিকা পরমাণু গঠিত হয়। সাংখ্য দর্শনে শব্দ তন্মাত্রার আদি অবস্থাকে বলে 'কারণ-আকাশ'। কারণ, এর থেকেই ক্রমে পঞ্চভূতের বিবর্তন ঘটে। কারণ-আকাশ প্রচ্ছন্ন শক্তি ও বস্তুময় এবং সর্বব্যাপী। আকাশ-পরমাণুকে বলা হয় 'কার্য-আকাশ'। এ পরমাণুর গুণ শব্দ। পরমাণু বলেই তা সর্বব্যাপী নয়, নির্দিষ্ট স্থানে সীমিত। কাজেই আকাশ এ ধারণাটি বৌদ্ধ, বৈশেষিক, জৈন, সাংখ্য, দর্শন ভেদে স্বতন্ত্র। এটি লক্ষ্য করার বিষয়, সাংখ্যে পঞ্চভূতকে তাদের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চিহ্নিত করা হয়নি। চিহ্নিত করা হয়েছে আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের কাজের প্রেক্ষিতে।

বৈশেষিক 'কাল'কে একটি দ্রব্য বলে বিবেচনা করেছে। আকাশের মতো কালও সর্বব্যাপী ও সবকার্যের সাধারণ কারণ। কাল পরমাণু গঠিত নয়। জৈন মতে কাল কণিকা গঠিত। কাল কণিকারা নিজেদের মধ্যে মিলিত হয় না কিন্তু পরমাণুদের পরিবর্তনে সহায়ক হয়। বৌদ্ধ ও সাংখ্য মতে কাল পরিবর্তনকে বুঝার উপায় মাত্র। তাই কাল বুদ্ধির সৃষ্টি। এর আলাদা অস্তিত্ব নেই।

বিরঞ্জন রায়: মনোরোগ চিকিৎসক ও লেখক
ইমেইল: bidhanranjan@gmail.com

পরবর্তী সংখ্যায়: পরমাণুবাদের সমর্থনে যুক্তিসমূহ। (তথ্যসূত্র একসঙ্গে দেয়া হবে)